Volume 25 : 2022-2023
Journal of Philosophy and the Life-world
Vidyasagar University, Midnapore, 721102 WB

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষাতত্ত্বের আলোকে বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্ব: একটি দার্শনিক আলোচনা

তুফান গিরি
গবেষক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সিটি কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ

যখন ভাষার সৃষ্টি হয়নি তখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত ইশারায়, ইঙ্গিতে, সাংকেতিক ধ্বনি প্রয়োগের মাধ্যমে। তারপর দীর্ঘ অনুশীলন, বিবর্তনের পথ দিয়ে সৃষ্টি হল ভাষা। পৃথিবীব্যাপি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলি থেকে বিভিন্ন মূল ভাষাবংশের সৃষ্টি হল, যার অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এই ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় ভাষা নিয়ে যারা দার্শনিক আলোচনা করেন তাদের আমরা ভাষাদার্শনিক বলে জানি। ভারতীয় ভাষা দার্শনিকরা হলেন পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি। এঁরা তাদের নিজ নিজ আলোকে ভাষাকে নিয়ে বর্ণনা করেছেন। ভাষার স্বরূপ নিয়ে ব্যাকরণবিদের যে মতবাদ প্রচলিত তা হল স্ফোটতত্ত্ব। অর্থাৎ, যা স্ফুটিত হয়। একে সঙ্কেতও বলতে পারি। ভাষার মাধ্যমে আমরা শব্দার্থজ্ঞানলাভ করি। ব্যাকরণবিদ ভাষাদার্শনিকদের এই স্ফোটতত্ত্বের বিষয়ে মতবিরোধের কোন শেষ নেই। এই স্ফোটতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর স্ফোটতত্ত্বের নাম হল বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্ব। এই বিদ্বৎরূঢ়ির দ্বারা যা অভিব্যক্ত হয় তা হল 'ওঁ' কার। এই 'ওঁ'কারের বাচক হল পরম অদ্বয়বস্তু। এই পরম অদ্বয়বস্তু হল ভগবান বা ব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্বের দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারাত্মক মননকেই নির্দেশ করেছেন। এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে আলোচিত করা হয়েছে।

বীজশব্দ: ভাষা, স্ফোট, বিদ্বৎরূঢ়ি, শব্দ, বর্ণ, ধ্বনি, অর্থ, চিহ্ন বা সঙ্কেত, শক্তি, শব্দস্ফোট, পদ, যৌগিক পদ, রূঢ়পদ, যোগরূঢ় পদ, যৌগিক রূঢ়, অঙ্গরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি, ওঁ, সাক্ষাৎকার মনন

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

যখন ভাষার সৃষ্টি হয়নি তখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত ইশারায়, ইঙ্গিতে, সাংকেতিক ধ্বনি প্রয়োগের মাধ্যমে। তারপর দীর্ঘ অনুশীলন, বিবর্তনের পথ দিয়ে সৃষ্টি হল ভাষা। পৃথিবীব্যাপি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা গোষ্ঠীগুলি থেকে বিভিন্ন মূল ভাষাবংশের সৃষ্টি হল, যার অন্যতম হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এই ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। আমাদের ভাববিনিময়ের প্রধান সোপান হল 'ভাষা'। ভাষার মাধ্যমে আমরা মানবসভ্যতা এমনকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। এককথায় বলতে গেলে আমরা ভাষার মাধ্যমে চিন্তা বা ভাবের আদান প্রদান করি। এই মানবীয় ভাষার মাধ্যমেই আমরা জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলির সাথে পরিচিতও লাভ করি। কিন্তু এই মানবীয় ভাষার স্বরূপ খুব সহজে বর্ণনা করা যায় না। বিশিষ্ট অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলেন – "Human language is a very complex phenomenon"[১] অর্থাৎ, মানবীয় ভাষা একটি জটিল ব্যাপার। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে 'ভাষা' কী? তাহলে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণবিদ্‌দের মতটিকে গ্রহণ করে উত্তর দিলে এর উত্তরে যা পাওয়া যাবে তা হল 'স্ফোট'। অর্থাৎ, প্রাচীন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে ব্যাকরণবিদ্‌গণ 'ভাষা' বলতে বোঝেন স্ফোটতত্ত্বকে। প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণবিদ বলতে এখানে পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, প্রভৃতি ব্যাকরণবিদ্ ভাষাতাত্ত্বিককে বুঝতে হবে।

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে এই স্ফোটতত্ত্ব একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। স্ফোটতত্ত্ব বিষয়ে নানা বিতর্কিত মত আমরা লক্ষ্য করব। স্ফোটতত্ত্বের আলোচনার বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকাও কোন অংশে কম বলা যাবে না। তিনিও তাঁর ভাষাতত্ত্বে এক অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে বা ভাষাদর্শনে এই স্ফোটতত্ত্ব অনেক প্রাচীন তাই প্রথমে আমি প্রাচীন তত্ত্বগুলিকে আলোচনা করে শ্রীচৈতন্যদেবকৃত বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্ব আলোচনা করব।

আমরা এখন শব্দের সঙ্গে অর্থ, অর্থের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করব। কেননা আমরা জানি ভাষার মাধ্যমে শব্দার্থজ্ঞান হয়ে থাকে। ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ন্যায়াচার্য গঙ্গাধর কর বলেন – "মানুষের দ্বারা উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য, ধ্বনি সমষ্টিই হল 'ভাষা'"।[২] আমরা বৈয়াকরণসম্মত যে ভাষাতত্ত্ব তা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। আমরা জানি বৈয়াকরণগণ ভাষা বলতে স্ফোটকেই বুঝিয়েছেন। এখন এই স্ফোটের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণত 'স্ফোট' শব্দটি 'স্ফুট' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই 'স্ফুট' ধাতুর অর্থ হল স্ফুটিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া। এককথায় বলতে গেলে যার থেকে অর্থ স্ফুটিত হয় বা প্রকাশিত হয় তা হল স্ফোট। বিশিষ্ট ভাষাদার্শনিক অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল বলেন – 'স্ফুট' থেকেই স্ফোটের উৎপত্তি। 'স্ফুট' বলতে বোঝায় 'to burst' অর্থাৎ, যা স্ফুটিত হয়। তিনি তাঁর

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

গ্রন্থে আরোও বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ করে এই স্ফোটকে ব্যক্ত করেন। কয়েকটি শব্দ হল – 'Meaning-bearers, mysterious entity' প্রভৃতি। তাঁর মতে স্ফোট হল, 'A simple meaning-bearing symbol'.[৩] অর্থাৎ, একটি সাধারণ অর্থবহনকারী সঙ্কেত। এখন আমরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাদার্শনিকের আলোচনা থেকে এই স্ফোটের ধারণাকে স্পষ্ট করব। সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য তাঁর 'অথ পাণিনিদর্শণম্' অধ্যায়ে গিয়ে বলেন – *"বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিঙ্গ্যোহর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি"*।[৪] বর্ণ থেকে আলাদা অথচ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থের বোধ উৎপাদক যে নিত্য শব্দ তাকেই বলা হয় স্ফোট। বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় বলে একে স্ফোট বলা হয়। বৈয়াকরণ দার্শনিকরা শব্দ থেকে অর্থবোধের জন্য এক, অখণ্ড ও নিত্য পদার্থ স্বীকার করে নিলেন, যাঁকে তাঁরা নাম দিলেন 'স্ফোট'। আমরা জানি শব্দ বা পদ থেকে অর্থের বা বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন শব্দ বা পদ উচ্চারণ করে তাহলে সেই শব্দ বা পদের দ্বারা আমাদের কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়ে থাকে। বিষয়টিকে আরোও একটু সহজ করে বোঝা যাক্। অর্থাৎ শব্দ বা পদের একটু আলোচনা করা যাক।

বৈয়াকরণ দার্শনিকরা নিত্য শব্দকেই স্ফোট বলে স্বীকার করেছেন। তাই আমাদের 'শব্দ' নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন, যেহেতু শব্দই হল স্ফোট। আমরা জানি শব্দ হল বর্ণসমষ্টি। অর্থাৎ, শব্দ একাধিক বর্ণের দ্বারা গঠিত হয়। এখন প্রশ্ন হল 'বর্ণ' কী? সহজ কথায় 'বর্ণ' হল ধ্বনির প্রতীক। এখন প্রশ্ন জাগবে 'ধ্বনি' বলতে কী বোঝায়? 'ধ্বনি' শব্দের নানা অর্থ পরিলক্ষিত হলেও এখানে 'ধ্বনি' বলতে আমাদের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন যে আওয়াজ তাকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, আমরা যে ধ্বনি উচ্চারণ করি সেই সব ধ্বনিকে লিখিত আকারে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য যে সব সাংকেতিক প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করি তাই হল 'বর্ণ'; বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধরণের বর্ণ ব্যবহার করা হয়। যেমন, আমাদের বাংলা ভাষায় বর্ণ হল, অ, আ, ই, ঈ, ক, খ প্রভৃতি। এককথায় অর্থসহযোগে ধ্বনি ও বর্ণের দ্বারা যা গঠিত হয় তাই হল শব্দ। এই শব্দের দ্বারা আমাদের অর্থের বোধ হয়। শব্দ থেকে কীভাবে অর্থের বোধ ঘটে তা নিয়ে ভাষা দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই।

মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্য শুরু করেছেন *'অথ শব্দানুশাসনম্'* এই বলে। অর্থাৎ, তিনি শব্দের গঠন, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করছেন। কেননা কোন কিছু আলোচনা করতে গেলে আমাদের তা শব্দের মাধ্যমেই শুরু করতে হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক যে প্রশ্নটি জাগে তা হল ভাষাতত্ত্বে শব্দের দ্বারা কীভাবে আমাদের লৌকিক ব্যবহার ঘটে চলেছে। কীভাবে শব্দের পরিবর্তন ঘটে, কীভাবে একটি শব্দের দ্বারা অর্থের বা বাচকের বা বিষয়ের বা নামীর জ্ঞান লাভ করি। মাধবাচার্য

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

'*পাণিনিদর্শনম্*' অধ্যায়ে বলেন শব্দের জ্ঞানলাভ করতে হলে আমাদের পদের জ্ঞান আলোচনা করতে হবে। এখন আমাদের জানা দরকার 'পদ' বলতে কী বোঝায়। বৈয়াকরণ দার্শনিক পাণিনি বলেন – '*সুপ্‌তিঙন্তং পদম্*' অর্থাৎ, সু, উ, জস প্রভৃতি বিভক্তির সঙ্গে তি, তস,অন্তি প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ গঠিত হয়। নিরুক্তকারের মতে বাক্যের অবয়বই হল পদ। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে শব্দই হল পদ। আবার ন্যায়, মীমাংসক দর্শনে পদ বলতে যা শক্তিবিশিষ্ট তাকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, এখানে পদের শক্তি স্বীকার করা হয়েছে। ন্যায়দর্শনে এই পদকে চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যৌগিক পদ, রূঢ় পদ, যোগরূঢ় পদ, যৌগিক রূঢ় পদ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা যে পদের অর্থ নিরূপিত হয় তা হল যৌগিক পদ। যেমন পাচক, পাঠক প্রভৃতি। 'রূঢ়ি' শব্দের অর্থ হল সমুদায় শক্তি, যে পদের অর্থ অবয়বশক্তির দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ ত্যাগ করে সমুদায় শক্তির দ্বারা অর্থ নিরুপিত হয় তা হল রূঢ় পদ। যেমন, গো, মণ্ডপ প্রভৃতি। গো = গম্ ধাতুর সঙ্গে 'ডো' প্রত্যয় যুক্ত। 'গম' ধাতুর অর্থ গমন করা কিন্তু 'গো' উচ্চারণ করলে আমরা গলকম্বল বিশিষ্ঠ প্রাণীকেই বুঝে থাকি। এখানে যে 'রূঢ়ি'র অর্থ ব্যাখ্যাত হল তা কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন স্বীকৃত রূঢ়ি নয়। পরবর্তীতে তা পরিষ্কার হবে। যৌগিক পদ ও রূঢ় পদের সংমিশ্রণে যে পদ গঠিত হয় তা হল যোগরূঢ় পদ। যেমন, পঙ্কজ, উদ্ভিদ প্রভৃতি। যে পদ কখনও যৌগিক আবার কখনও রূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হল যৌগিক রূঢ় পদ। যেমন উদ্ভিদ, মণ্ডপ প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে রূঢ় পদ আবার তিন প্রকার – নৈমিত্তিক, পারিভাষিক ও ঔপাধিক।[৫] যে পদ জাতিকে নিমিত্ত করে অর্থ প্রতিপাদন করে তা হল নৈমিত্তিক পদ। যেমন, 'গো' যে পদ একব্যক্তিক গুণ বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদন করে তা হল পারিভাষিক পদ। যেমন, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি। যে পদ অনুগত ধর্মের অর্থ প্রতিপাদন করে তা হল ঔপাধিক পদ। যেমন, দূত, কৃশ প্রভৃতি।

আমরা শব্দ বা পদের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে তা কোন না কোন বাচকের বা অর্থের জ্ঞান দেয়। বৈয়াকরণ দার্শনিকদের মত গ্রহণ করে আমি পদ ও শব্দকে সমার্থক বলেই গণ্য করেছি। কেননা শব্দ থেকে যেমন শব্দার্থের জ্ঞান লাভ করি, তেমনি পদ থেকেও পদার্থের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। দুটোই বাচককে নির্দেশ করে। এখন আমরা মূল প্রশ্নে ফিরে যাব। অর্থাৎ, কীভাবে শব্দ বা পদ দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয়ে থাকে? শব্দ যেহেতু বর্ণের সমষ্টি সেহেতু প্রশ্ন হতে পারে বর্ণগুলি পৃথক পৃথকভাবে অর্থের বাচক হয়, না বর্ণগুলি একত্রিত হয়ে অর্থের বাচক হয়? অর্থাৎ, বর্ণসমষ্টি না বর্ণব্যষ্টির দ্বারা অর্থের বোধ ঘটে। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বৈয়াকরণ দার্শনিকরা বর্ণ থেকে অতিরিক্ত অথচ বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থপ্রত্যায়ক এক

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

নিত্য শব্দ স্বীকার করেন, যাঁর নাম দেন স্ফোট। অর্থাৎ, এই সমস্যা সমাধানের জন্যই স্ফোটতত্ত্বের অবতারণা।

বৈয়াকরণ দার্শনিকরা বলেন বর্ণগুলি পৃথক পৃথকভাবে যেমন অর্থের বাচক হয় না তেমনি বর্ণগুলি একত্রিত হয়েও অর্থের বাচক হতে পারবে না। বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে। যেমন, 'ভক্ষণ' নামক একটি শব্দ নেওয়া যাক্। এই শব্দটিতে ভ, ক, ষ, ণ এই চারটি বর্ণ আছে। এই চারটি বর্ণ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করলে যদি অর্থের জ্ঞান হয়ে যেত তাহলে কোন ব্যক্তি শুধু 'ভ' উচ্চারণ করলেই 'ভক্ষণ' নামক ক্রিয়ার জ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু, বাস্তবে যদি কোন ব্যক্তি শুধু 'ভ' উচ্চারণ করে তাহলে তা ভক্ত, ভক্তি প্রভৃতিকেও নির্দেশ করতে পারে। অন্যান্য বর্ণগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং, যদি বর্ণ পৃথক পৃথকভাবে (যেমন, ভ, ক, ষ, ণ) উচ্চারিত হয় তাহলে তা থেকে কোনো অর্থেরই বোধ হবে না।

অন্যদিকে, বর্ণগুলি একত্রিত হয়েও অর্থের বোধ ঘটাতে পারবে না। কেননা আমরা জানি বর্ণমাত্রই ক্ষণিক অর্থাৎ একটি বর্ণ উচ্চারিত হওয়ার পরক্ষণে সেই বর্ণ বিনাশ হয়ে যায়। বর্ণ হল আশুবিনাশী। যেমন, 'ভক্ষণ' শব্দটিতে চারটি বর্ণ আছে, যথা – ভ, ক, ষ, ণ। যদি দ্বিতীয় বর্ণ 'ক' উচ্চারণ করা হয় তাহলে প্রথম বর্ণ 'ভ' বিনষ্ট হবে। তৃতীয় বর্ণ 'ষ' উচ্চারিত হলে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক' বিনষ্ট হবে। চতুর্থ বর্ণ 'ণ' উচ্চারিত হলে তৃতীয় বর্ণ 'ষ' ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় এই বর্ণগুলির একই সাথে একত্রিত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই বর্ণ একত্রিত না হলে তা শব্দ গঠন করতে পারবে না, শব্দ গঠিত না হলে অর্থেরও বোধ ঘটবে না। উপরিউক্ত উদাহরণে বর্ণগুলি যেমন পৃথক পৃথকভাবে অর্থের বোধ ঘটাতে পারেনি তেমনি বর্ণগুলির একত্রিত হওয়াও সম্ভব হল না। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য বৈয়াকরণ দার্শনিকরা বলেন – বর্ণ থেকে অতিরিক্ত বর্ণসমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত একপ্রকার আন্তর পদার্থ স্বীকার করতে হবে। সেই পদার্থই হল স্ফোট। যা কিনা অর্থের বোধ ঘটাতে সক্ষম। উপরিউক্ত উদাহরণে চারটি বর্ণের দ্বারা (ভ, ক, ষ, ণ) প্রথমে স্ফোটের অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ স্ফুটতা উৎপন্ন হয়ে পরে স্ফুটকে স্ফোট দ্বারা ভক্ষণ ক্রিয়ার বোধ ঘটায় বা অর্থের বাচক হয়।[৬] বৈয়াকরণ দার্শনিকরা বলেন পৃথকভাবে উচ্চারিত যে বর্ণ তা শব্দ নয়, শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনিমাত্র। বর্ণের দ্বারা বর্ণের অতিরিক্ত শব্দের অভিব্যক্তি হয়। এই অভিব্যঙ্গ শব্দই বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের বাচক। এমনকি এটি নিত্য। আমরা জানি বর্ণ অনেক হলেও একটি বর্ণ উচ্চারিত হলে একটি মাত্র পদেরই অভিব্যক্তি হয়। এই অভিব্যক্তির কারণ হল পরাবাক্ এর অন্তরতমরূপশব্দ – একেই আমরা স্ফোট বলতে পারি। সাধারণত স্ফোটের দুটি অর্থ পাওয়া যায় – একটি হল যা বর্ণসমূহের দ্বারা স্ফুটিত হয় বা যা বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্তির যোগ্য। অন্যটি হল – যা অর্থবোধের বা প্রত্যয়ের কারণ।[৭] স্ফোট যে

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

অর্থবোধের কারণ তা আমরা আলোচনা করেছি। এখন দেখা যাক্ স্ফোট কীভাবে স্ফুটিত হয়। অর্থাৎ, একটি শব্দের স্ফুটনকে কীভাবে অভিব্যক্ত করা যায়।

বৈয়াকরণ দার্শনিকরা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করেছেন। তাঁরা স্ফোটের অভিব্যক্তির জন্য চারপ্রকার স্তর বা বাক্‌তত্ত্বের কথা বলেছেন। যথা - পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। প্রথমে বক্তার মূলাধারে স্ফোটের অভিব্যক্ত হয়। এই স্তরকে বলা হয় পরা। এই স্তরকে শব্দের মূল উপাদান বলা যায়। এই স্তরে শব্দের সঙ্গে অর্থের কোন সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় না। এটি হল শব্দের 'গর্ভাশয়'।[৮] পরাবাক্‌তত্ত্বের পরবর্তী স্তর হল পশ্যন্তী। প্রাণবায়ুর চালনায় নাভিদেশে যখন শব্দের অভিব্যক্তি হয় তখন তা হল পশ্যন্তী। এই স্তরে বাক্‌তত্ত্বের সঙ্গে অর্থতত্ত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই স্তরকে বলা হয় শব্দের 'গর্ভকাল'। পশ্যন্তীবাক্ যখন প্রাণবায়ুর দ্বারা আরো উপরে ওঠে হৃদয়দেশে অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় মধ্যমা। এই স্তরটি মন ও বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য। এটিকে শব্দের 'প্রসবকাল' বলা যেতে পারে। এই মধ্যমা স্তরের দ্বারা জড়, মূক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অর্থের বোধ করতে সমর্থ হয়। প্রাণবায়ু যখন হৃদয়দেশ থেকে আরো উপরে ওঠে কণ্ঠদেশে বা বাক্‌যন্ত্রে এসে পৌঁছায় তখন তা হল বৈখরী। এই স্তরেই শব্দের উচ্চারণ হয়, এমনকি শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে থাকে। একে শব্দের 'প্রসূতকাল' বলা যেতে পারে। এইভাবে স্ফোটের অভিব্যক্তির ফলে আমাদের শব্দের অর্থবোধ ঘটে থাকে। অর্থাৎ, কোন শব্দ উচ্চারিত হলে প্রথম বর্ণ অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে স্ফোটের প্রকাশ ঘটায়, পরেরটি আর একটু স্পষ্টভাবে, তার পরেরটি আরও স্পষ্টভাবে, পরেরটি আরও স্পষ্টভাবে স্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটায়। সর্বশেষ যে বর্ণ অর্থের পূর্বপ্রত্যক্ষজনিত সংস্কারের সহযোগীতায় স্ফোটকে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত করে শব্দের অর্থের বাচক হয়। অর্থাৎ, আমাদের শব্দের অর্থের জ্ঞানলাভ হয়।

ভারতীয় ভাষাদর্শনে এই স্ফোটতত্ত্বের বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতভেদ পরলক্ষিত হয়। আমি বিশেষভাবে বৈয়াকরণ দার্শনিক পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি ও জৈমিনির মত সংক্ষেপে আলোচনা করে চৈতন্যকৃত স্ফোটতত্ত্বে প্রবৃত্ত হব। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বিভূতিপাদে স্ফোটতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন –

"শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাস্যাৎ সঙ্করস্তু প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্" [৯]

শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এদের পরস্পরের অধ্যাসবশতঃ সঙ্কর হয়। অর্থাৎ, উক্ত তিনটিকে অভিন্ন বলে প্রতীতি হয়। যদি ভাগ করে সংযম করা হয় তাহলে সমস্ত প্রাণীর শব্দ জানা যায়, পশুপক্ষী প্রভৃতি কিরূপ শব্দ করে তা বোঝা যাবে। তিনি বলেন বাগইন্দ্রিয় অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ, কোন বর্ণ যেমন, অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বাগইন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হয়, তখন মনে রাখা দরকার বর্ণ কিন্তু অর্থের বাচক নয়। পরবর্তীতে হৃদয় দেশ থেকে উত্থিত

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

উদানবায়ু বাগ ইন্দ্রিয়ে এসে পৌঁছায় এবং বর্ণের আকাররূপে শব্দ উৎপন্ন করে। এই শব্দ প্রবাহরূপে শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে অনুভূত হয়, কিন্তু এর দ্বারাও অর্থের বোধ হয় না। পরবর্তীতে প্রসিদ্ধ বর্ণগুলিকে গ্রহণ করে পরে সেই সকলের একত্ব প্রতীতি হয়। এই একত্ব প্রতীতিকে বলা হয় অনুসংহারবুদ্ধি।[১০] এই অনুসংহার বুদ্ধির দ্বারা পদ গৃহীত হয়। একে তাই পদস্ফোট বা শব্দস্ফোটও বলা যেতে পারে। এই অনুসংহার বুদ্ধির পরেই শব্দ থেকে অর্থের বোধ ঘটে স্ফোটের দ্বারা। যেমন, 'গৌঃ' শব্দটি তিনটি বর্ণের দ্বারা গঠিত, গ-কার, ঔ-কার এবং বিসর্গ। এই তিনটি বর্ণ যখন অব্যবধানবশতঃ ক্রমশ উচ্চারিত হয় এবং বুদ্ধিতে একরূপ প্রতীতি হলে 'গৌঃ' শব্দের দ্বারা গো-রূপ প্রাণীর বোধ ঘটে। অর্থাৎ, অর্থের বাচক হয়।

মহর্ষি জৈমিনী ও ভাষাতত্ত্বের ব্যাখায় স্ফোটকে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, শব্দ থেকে অর্থবোধের কথা বলেছেন। তিনি শব্দকে নিত্য বলেছেন। শব্দকে নিত্য বলা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই, কেননা উচ্চারণের দ্বারা পূর্বের অবগত শব্দ পরবর্তীতে শব্দবোধের হেতু হয়। শব্দ পূর্ব থেকেই আমাদের বুদ্ধিতে থাকে। অর্থাৎ, শব্দ পূর্ব থেকেই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কোন এক বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। বিষয়টিকে আর একটু সহজ করা যাক্ কোন বক্তার বুদ্ধিতে তার পূর্ব থেকে দৃষ্ট হয়ে যা প্রকাশিত করে সেই ধ্বনি বক্তার মাধ্যমে উচ্চারিত হয়, পরবর্তীতে শ্রোতা সেই ধ্বনির দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে স্ফোটের দ্বারা অর্থবোধ করে থাকে। যেমন, "প্রকাশক অথবা দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে একটি বস্তু আমার দর্শনের বিষয় হয়েছে" - এই বাক্যকে কোন প্রকাশক বস্তু বলা যাবে না তেমনি তা উচ্চারিত ধ্বনিও নয়। কিন্তু, যার দ্বারা এখানে অর্থবোধ ঘটে তা হল স্ফোট।[১১]

বৈয়াকরণ দার্শনিক ভর্ত্তৃহরি "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে স্ফোটতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যা থেকে অর্থের অভিব্যক্তি হয় তা হল স্ফোট। এই স্ফোট হল অর্থের বাচক। এটী এমন এক পদার্থ যা নিত্য, বিভু ও এক। স্ফোটের পূর্বে থাকে ধ্বনি। তাঁর মতে ধ্বনি দু'প্রকার – প্রাকৃত ধ্বনি ও বৈকৃত ধ্বনি। তিনি বলেন প্রাকৃত ধ্বনিই হল স্ফোটের হেতু। উচ্চারিত ধ্বনির যে মাত্রাভেদ তা হল বৈকৃত ধ্বনি। বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক্। ধরা যাক্, যদি আমি কোন একটি বড় শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করি (যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া) তাহলে সেই শ্রেণীকক্ষের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারীর ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শেষের সারীর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আমার পাঠদান সমানভাবে শব্দের গ্রহণযোগ্যতা গৃহীত হবে না। অর্থাৎ, যদি আমি 'মাঠ' শব্দটি উচ্চারণ করি তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সেই শব্দের মাত্রাভেদ হতে পারে কিন্তু শ্রবণের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও অর্থবোধের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ, 'মাঠ' শব্দটি খেলার মাঠকেই নির্দেশ করবে। এখানে শব্দের উচ্চারণের মাত্রা ভিন্ন হলেও অর্থের বোধের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

হবে না। এই 'মাঠ' শব্দটির অর্থ প্রকাশের হেতু হল 'স্ফোট'। অর্থাৎ, প্রথম উচ্চারিত যে ধ্বনি তাহল স্ফোট। আর একেই ভর্তৃহরি প্রাকৃত ধ্বনি বলেছেন। আর পরবর্তীতে শব্দের যে মাত্রাভেদ তা হল বৈকৃত ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতধ্বনি হল স্ফোটের হেতু। শেষ বিচারে ভর্তৃহরি সমগ্র শব্দকেই ব্রহ্মপদবাচ্য বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে শব্দই ব্রহ্ম। সমস্ত শব্দের অর্থের বাচক হল ব্রহ্ম।

এইসব আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে স্ফোট হল এক অর্থবহনকারী সঙ্কেত। যা ভাষার অর্থবহনের মূল চলিকা শক্তি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজে বলা যায় যে অর্থবোধের ক্ষেত্রে পদ ও পদার্থ, বাচ্য ও বাচককে পৃথকভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শেষ বিচারে এই বাচ্য-বাচকের ভেদ পরিলক্ষিত হয় নি। তা আলোচনা কালেই পরিষ্কার হবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনিও শব্দ থেকে অর্থবোধের জন্য ভাষাতত্ত্বে স্ফোট তত্ত্ব স্বীকার করে নিলেন। তাঁর স্বীকৃত স্ফোটতত্ত্ব হল বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্ব। তিনি যেহেতু (শিক্ষাষ্টক ছাড়া) কোন গ্রন্থ রচনা করেননি সেহেতু তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করতে হলে তাঁর পার্ষদদের গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যের দার্শনিকতত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীজীব গোস্বামী তিনি তাঁর ষট্সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যানে চৈতন্যকৃত স্ফোটতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তাঁর অনুব্যখ্যানটির নাম হল '*সর্ব্বসম্বাদিনী*'। তিনি বৈয়াকরণসম্মত স্ফোটতত্ত্বকে পরিহার করে চৈতন্যকৃত বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছেন। তিনি বলেন বৈদিক শব্দ হল নিত্য এই বৈদিক শব্দ নিজ অর্থেই প্রমাণ। প্রচীনভারতীয় দর্শনে এই বৈদিক শব্দ থেকেই জগতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ, বৈদিক শব্দ থেকেই অর্থেরবোধ হতে পারে। আমরা পূর্বে দেখলাম যে বর্ণসমষ্টি থেকে অর্থবোধ হতে পারে না। তাই বৈয়াকরণ দার্শনিকরা স্ফোটতত্ত্বের দ্বারা অর্থবোধের কথা বলেছেন। বৈয়াকরণ দার্শনিক জৈমিনি শব্দের সঙ্গে অর্থের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তিনি বলেন শব্দের অর্থবোধের জন্য আমাদের অন্য কারও সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। তাই শব্দ হল Absolute, যা নিত্য ও নিরপেক্ষ।[১২]

ভারতীয় ভাষাদর্শনে প্রাচীনকাল থেকেই আমরা দেখেছি বৈদিক শব্দ থেকে জগতের উৎপত্তির কথা? অর্থাৎ, বৈদিক শব্দগুলি বর্ণরূপ অথবা স্ফোটরূপ? বৈদিক শব্দ বর্ণাত্মক রূপের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা বর্ণগুলি আশুবিনাশী তেমনিভাবে জগতের ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ স্ফোটকে গ্রহণ করা যায় না, কেননা, স্ফোটের অস্তিত্ব নিয়ে কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। বিষয়টিকে একটু সহজ করা যাক্। যারা অর্থবোধের ক্ষেত্রে বর্ণাত্মকতা স্বীকার করেন তারা

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

বলেন যে বর্ণগুলি আশুবিনাশী হলেও পূর্ব পূর্ব অক্ষরের সংস্কারের পর পর অক্ষরে সঞ্চারিত হয়ে অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে এখানে সংস্কার বলতে দু'প্রকার সংস্কারকে বুঝতে হবে। একটি হল – বর্ণজনিত অপূর্ব্বাখ্য সংস্কার, অন্যটি হল – বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার।

সাধারণ স্ফোটবাদীরা এই দুই প্রকার সংস্কারের দ্বারা যে অর্থবোধ হতে পারে না তা দেখানোর চেষ্টা করেন। তারা বলেন অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারের কথা বলা যাবে না। কেননা, ধূম বা হেতু যেমন স্বয়ং প্রতীত হয়ে বহ্নির অনুমানরূপ হেতু হয়। তেমনি শব্দও সম্বন্ধ গ্রহণের অপেক্ষা করে। গৃহীত সম্বন্ধ শব্দ স্বয়ং প্রতীত হয়ে অর্থবোধ করায়, এখানে সংস্কারসহিত জ্ঞান শব্দই অর্থবোধের হেতু। তাই অপূর্ব্বাখ্য সংস্কারের প্রয়োজন নেই। আবার বর্ণানুভবজনিত ভাবনাখ্য সংস্কারের দ্বারাও অর্থবোধ হতে পারবে না। এই সংস্কার আবার দু'প্রকার – প্রত্যক্ষজ্ঞাত ও কার্য্যলিঙ্গের দ্বারা জ্ঞাত। আমরা জানি বর্ণের যে অনুভবজনিত সংস্কার তা প্রত্যক্ষিত নয়, তাই প্রত্যক্ষজ্ঞাত সংস্কার অর্থবোধের হেতু নয়। অন্যদিকে, কার্যলিঙ্গজ্ঞাত সংস্কারের দ্বারা ফলসিদ্ধি সম্ভব নয়। কেননা, সংস্কার কার্য্য ও স্মরণের ক্রমবর্ত্তিতাকে অপেক্ষা করে। এখানে 'কার্য্য' বলতে অর্থবোধকে বুঝতে হবে। আমরা জানি অর্থবোধ হলে সংস্কার প্রত্যয় জন্মায়, আবার সংস্কার প্রত্যয় হলে অর্থের বোধ হয়। এটিকে বলা হল পরস্পরাশ্রয়। এই পরস্পরাশ্রয় দোষের জন্য স্ফোটবাদীরা কার্যলিঙ্গ দ্বারা জ্ঞাত সংস্কারকেও অর্থবোধের হেতু বলেননি।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বৈয়াকরণ দার্শনিকরা এক নিত্য, বিভু শব্দকে স্বীকার করেন তা হল স্ফোট। যা বর্ণ থেকে ভিন্ন হয়ে বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত। আমরা জানি শব্দ মাত্রই বর্ণসমষ্টি। এক এক শব্দে অনেক বর্ণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় জন্মায়, একই প্রত্যয় কখনো জন্মায় না। কিন্তু, স্ফোটের স্বভাব হল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণপ্রত্যয়ে ন্যাস্ত সংস্কারবীজ আন্ত্যবর্ণের প্রত্যয়জনিত পরিপাক। শব্দার্থবোধযোগ্য চিত্তে এক প্রত্যয় বিষয়রূপে অতি দ্রুত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, একটি শব্দের দ্বারা একটি বিষয়ের অর্থবোধ হতে পারে।

উক্ত দুটি মতবাদের আলোচনায় দেখা গেল জটিলতা কেননা স্ফোটবাদ বর্ণকে পরিহার করে দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনা দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, তাদের মতে বর্ণ সকল ক্রমানুসারে গৃহীত হয়ে স্ফোট অভিব্যক্ত করে, আর এই স্ফোটের দ্বারাই অর্থবোধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এখানে কল্পনার আধিক্যই বেশী প্রাধান্য পায়। তাই আমাদের বর্ণরূপবেদসমূহকে নিত্য ও অর্থপ্রত্যায়ক বলে স্বীকার করতে হবে।[১৩]

এই সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বর্ণাত্মকতা ও স্ফোটতত্ত্বকে পরিহার করে বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্বের অবতারণা করলেন। এখন আমাদের 'বিদ্বৎরূঢ়ি' বলতে কী বোঝায় তা জেনে নেওয়া

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

দরকার। পূর্বে আমি পদের আলোচনায় এই রূঢ়ি পদ ব্যাখ্যা করেছি। সাধারণত 'রূঢ়ি' বলতে সমুদায় শক্তিকে বোঝানো হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে 'রূঢ়ি' কোন সমুদায় শক্তি নয়। এককথায় যে শক্তি যৌগিক না হয়েও অর্থের বোধ ঘটায় তা হল রূঢ়ি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে এই 'রূঢ়ি' সাধারণত তিন প্রকার। যথা – অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বৎরূঢ়ি।[১৪] যা ব্যবহারিক জগতে রজো ও তমোগুণের মর্যাদাকে স্থাপন করে তা হল অজ্ঞরূঢ়ি। যা ব্যবহারিক পরিভাষায় বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তি আরোপ করে তা হল সাধারণরূঢ়ি। অন্যদিকে যা অদ্বয় জ্ঞানের বিষয়কে নির্দেশ করে তা হল বিদ্বৎরূঢ়ি। সহজভাবে বলতে গেলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অর্থের জ্ঞানের জন্য যে সকল রূঢ়ি তাহল সাধারণরূঢ়ি ও অজ্ঞরূঢ়ি। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অদ্বয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ জ্ঞানের জন্য যে রূঢ়ি তা হল বিদ্বৎরূঢ়ি। এখানে রূঢ়ি হল – বর্ণ থেকে ভিন্ন বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থের জ্ঞান উৎপাদক নিত্য শব্দরূপ এক আন্তর পদার্থ। আর তাই হল স্ফোট। বিদ্বৎরূঢ়ি কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতা ছাড়াই বর্ণ থেকে ভিন্ন হয়েও যে বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় তা হল – ওঁ। এই 'ওঁ' কার হল বিদ্বৎরূঢ়িগত অর্থের দ্যোতক। ভাগবত মহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্দে এই 'ওঁ' কারের নিমিত্ত বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্বের তাৎপর্য তুলে ধরা যেতে পারে।

ভাগবত মহাপুরাণে বলা হয়েছে যে – ব্রহ্মা পূর্বসৃষ্টির জ্ঞান সম্পাদন করার জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন। তাঁর হৃদয়াকাশ থেকে কণ্ঠ, তালু ইত্যাদি স্থান সকলের সংঘর্ষ ছাড়া এক অতি আশ্চর্যজনক 'অনাহত নাদ' সৃষ্টি হয়। আমরা যখন মনোবৃত্তিকে নিরোধ করতে পারব তখন এই অনাহত নাদ অনুভূত হবে। অনাহত নাদ থেকে 'অ' কার, 'উ' কার, 'ম' কার রূপ ত্রিমাত্রা যুক্ত 'ওঁ' কার উৎপন্ন হয়। এই 'ওঁ' কারের শক্তিতে প্রকৃতি অব্যক্ত থেকে ব্যক্তরূপে পরিণত হয়। এই 'ওঁ' কার স্বয়ং অব্যক্ত, অনাদি এবং প্রকাশ স্বরূপ। আমরা 'ওঁ' কারের দ্বারাই পরমভগবানকে লাভ করতে পারি। তাই বলা হয়েছে –

"শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূণ্যদৃক্
যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যমং ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ"।[১৫]

যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হয়ে যায় তখনও এই 'ওঁ' কারকে সমস্ত অর্থ প্রকাশক স্ফোটতত্ত্বকে যে শোনে ও সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থায় সকলের অভাবকেও যে জানতে পারে তাই হল পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ। এই 'ওঁ' কার নিজ আশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক। এই 'ওঁ' কার থেকেই সমস্ত বর্ণের (যেমন- অ, আ, ক, খ ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়েছে। তাই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ' শ্রী হরিনামামৃত-ব্যাকরণম্' গ্রন্থের *'সংজ্ঞাপ্রকরণম'* এর শুরুতে বলেছেন –

"নারায়ণাদুদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রমঃ , অ, আ, ই, ঈ .... [১৬]

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

বর্ণাক্রমই নারায়ণ থেকেই উৎপন্ন। যেমন – অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্যদেবকৃত এই বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্ব তাঁর মুখনিঃসৃত বানী *‘শিক্ষাষ্টকে’ও* লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন –

> *“চেতোদর্পণমাজ্জণ্যং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ্যং*
> *শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্*
> *আনন্দাম্বধিবর্দ্ধণং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং*
> *সর্ব্বাত্মাস্পণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনম্।”*[১৭]

শ্রীচৈতন্যদেবের মতে শ্রীহরি হল একমাত্র কীর্তনীয় বস্তু। তাই আমাদের কর্তব্য হল শ্রীহরির নাম, রূপ ও গুণাদি কীর্তন করা। জিহ্বার স্পন্দনে শ্রীনামের উচ্চারণ হয়। যেকোন ব্যক্তি খুব সহজেই শ্রীনামের উচ্চারণ করতে পারেন। উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে শ্রীনামসংকীর্ত্তন হয় ‘*বিদ্যাবধূজীবনম্*’ অর্থাৎ, সমস্ত বিদ্যার মূল নিহিত আছে শ্রীহরির মধ্যে তাই তাঁর নামসংকীর্তনই হল আমাদের মূল পথের চালিকা শক্তি।[১৮]

সুতরাং প্রত্যেক শব্দের বাচক হল এই পরমবস্তু ভগবান শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণ। শেষবিচারে প্রত্যেক শব্দের দ্বারা স্ফোটধর্মের সাহায্যে বিদ্বৎরূঢ়িগত অর্থ প্রকাশিত হয়। যখন কোন ব্যক্তি গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করে, দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেই সময় জীবের হৃদয়াকাশে যে ধর্মের প্রকাশ ঘটে তা হল বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটধর্ম। সাধারণ ইন্দ্রিয়জাত যে সব রূঢ়ি অর্থাৎ, সাধারণ ও অজ্ঞরূঢ়ি দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীমূর্তির প্রকাশ পায়। এখানে কিন্তু বাচ্য-বাচকের অথবা শব্দ থেকে শব্দার্থের বোধ ভিন্ন ভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। তাই আমরা মূর্তির দর্শন করি, এখানেই এই রূঢ়ির প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্বে বাচ্য-বাচকের ভেদ অথবা শব্দ থেকে শব্দার্থের ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। তাই সেখানে শ্রীমূর্তিরও কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। সুতরাং শব্দ থেকে অর্থবোধের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব স্ফোট স্বীকার করলেও তা কিন্তু বৈয়াকরণ সম্মত স্ফোটতত্ত্ব নয়, তা হল বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষাতত্ত্বে তাই ‘স্ফোট’ বলতে অব্যক্ত ‘ওঁ’ কারকেই বুঝতে হবে।[১৯] এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে – অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য ‘*ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*’ বলতে ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছাকেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ‘*ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*’ বলতে অদ্বয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারাত্মক মননকেই নির্দেশ করে। এই বিদ্বৎরূঢ়িই হল সাক্ষাৎকারাত্মক মননের উৎপাদক।

পরিশেষে, বলা যায় যে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে বৈয়াকরণ স্বীকৃত স্ফোটকে নিয়ে যে মতবিরোধ। অর্থাৎ, স্ফোট বিষয়ে নানা ভাষা দার্শনিকে নানা অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তার এক সহজ সমাধান

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষাদর্শনে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এক সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ স্ফোটতত্ত্বে আমরা যে বর্ণের সঙ্গে শব্দের, শব্দের সঙ্গে অর্থের, বাচ্যের সঙ্গে বাচকের ভেদ পরিষ্কার করেছি তা কিন্তু শ্রীচৈতন্যেদেবের ভাষাতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীচৈতন্যেদেবের ভাষাতত্ত্বে বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটের দ্বারা এই ভেদকে পরিহার করে অভেদকেই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র বাচককেই নির্দেশ করা হয় না, বাচ্যের ও বিচার করা হয়েছে। তাই আমরা নাম ও নামীকে অভিন্ন বলে গণ্য করতে সমর্থ হই। অর্থাৎ, শেষ বিচারে প্রত্যেক শব্দই পরম বস্তুকে নির্দেশ করে যা কিনা অদ্বয় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারাত্মক মনন। এই বিদ্বৎরূঢ়িগত স্ফোটতত্ত্বই হল এই সাক্ষাৎকারাত্মক মননের উৎপাদক।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। Matilal, Bimal Krishna. *The Word and The World India's Contribution to the Study of Language*. Oxford: Oxford University Press, 1990. p -3.

২। কর, শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়াচার্য্য. *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা.* কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড স্টাডি ইন ফিলোসফি, সহযোগে মহাবোধি বুক্ এজেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫. পৃ. ৩.

৩। Matilal, Bimal Krishna. *The Word and The World India's Contribution to the Study of Language*. Oxford: Oxford University Press, 1990. p -77.

৪। চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি, অনুবাদক. *সায়নমাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ.* দ্বিতীয় খণ্ড. কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৪১৫. পৃ. ২৬৬.

৫। মিশ্র, প্রভাত. *শব্দার্থদর্শনকণিকা.* মেদিনীপুর: দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩. পৃ. ১৯.

৬। গোস্বামী, শ্রীকেশব. *চার বৈষ্ণব আচার্য এবং গৌড়ীয় দর্শন.* গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ, অনুবাদক, ও সম্পাদক. ইস্কন্: গৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট , ২০০১. পৃ. ২৪৬।

৭। চক্রবর্ত্তী, সত্যজ্যোতি, অনুবাদক. *সায়নমাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ.* দ্বিতীয় খণ্ড. কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৪১৫. পৃ. ৯৬।

৮। কর, শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়াচার্য্য. *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা.* কলকাতা: সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড স্টাডি ইন ফিলোসফি, সহযোগে মহাবোধি বুক্ এজেন্সি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫. পৃ. ৪৩।

৯। *যোগসূত্র – ৩/১৭*

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

১০। বেদান্তচঞ্চু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র. *পাতঞ্জল যোগদর্শন*. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৮৯৮. পৃ. ২০০.

১১। গোস্বামী, শ্রীকেশব. *চার বৈষ্ণব আচার্য এবং গৌড়ীয় দর্শন*. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ, অনুবাদক, ও সম্পাদক. ইস্‌কন্‌: গৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ স্ট্রা , ২০০১. পৃ. ২৪৯.

১২। গোস্বামী, শ্রীজীব. *সর্ব্বসম্বাদিনী*. বিদ্যাভূষণ, রসিকমোহন, সম্পাদক, ও অনুবাদক. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৭. পৃ. ১৮৮.

১৩। তদেব, পৃ. ১৯৮.

১৪। গোস্বামী, শ্রীকেশব. *চার বৈষ্ণব আচার্য এবং গৌড়ীয় দর্শন*. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণ, অনুবাদক, ও সম্পাদক. ইস্‌কন্‌: গৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ স্ট্রা , ২০০১. পৃ. ২৫৭.

১৫। *শ্রীমদ্ভগবতমহাপুরাণ – ১২/৬/৪০.*

১৬। গোস্বামী, শ্রীজীব. *শ্রী হরিনামামৃত ব্যাকরণম্*. কলকাতা: শ্রীকৃষ্ণাদেবী, মাধব ভবন, ২০১৪, পৃ. ৮.

১৭। গোস্বামী, শ্রীমৎ ভাগবত. *শ্রী শ্রী শিক্ষাষ্টক*. কলকাতা: গৌড়ীয় মিশন, ১৯৬১. পৃ. ৩.

১৮। তদেব – পৃ. ২৯.

১৯। দাস, শ্রীহরিদাস. *গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান*. ১ম. খণ্ড. কলকাতা: সংস্কৃত বুক্ ডিপো, ১৪২১. পৃ. ৮৯৬.

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore